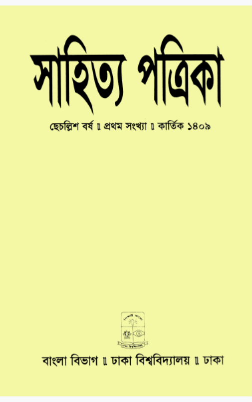

Vol. 46 | No. 1 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

'বিষাদ-সিন্ধু'-র ঔপনিবেশিক পটভূমি

Volume	46
Issue	1
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শামসুদ্দিন চৌধুরী
Published online	October 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v46i1.343
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i1.343
Pages	৫১-৬২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

'বিষাদ-সিন্ধু'-র ঔপনিবে

Check for updates

শামসুদ্দিন চৌধুরী *

উপন্যাসের সীমা-সরহদ্দে 'বিষাদ-সিন্ধু' পড়ে কিনা এমন প্রতিপাদ্য রচনাটির সমসাময়িককাল থেকে অব্যাহত রয়েছে। রচনাটির ঐতিহাসিকতা নিয়েও বিতর্ক হয়েছে বিস্তার, এমনকি এর ভ্রম সংশোধনার্থে 'মহরম শরীফ' জাতীয় দোভাষী কাব্যও রচিত হয়েছে। আধুনিক সমালোচকবৃন্দকেও 'বিষাদ-সিন্ধু'র ইতিহাস-আশ্রয় নিয়ে গলদঘর্ম হতে লক্ষ করা গেছে। এ সমুদয় অনুসন্ধানের জ্যা নিবদ্ধ রয়েছে মীরের মানসভূগোল নির্মাণের লক্ষ্যে, অথচ দু'একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া মখাররফ-চর্চা 'বিষাদ-সিন্ধু'র উৎসসন্ধানের অর্থরিক্ত প্রয়াসেই ব্যাপৃত ছিল। এ প্রবণতার সম্ভাব্য দুটি কারণ হতে পারে, এর আধেয় বাঙালি মুসলমানের আবাল্য পরিচিত আর পাকিস্তান নামক ধর্মরাষ্ট্রের উপযোগী সাহিত্য-ঐতিহ্য নির্মাণের কষ্টকল্পিতপ্রয়াস। এই দুয়েরই মূলে রয়েছে... মুসলিমমানস; অবশ্যই যা জাতিগত, ব্যক্তিগত তত নয়। লোকমানস গঠনে চেনাজানা আধেয়ের কারণে আধার-এর প্রসঙ্গটি উপযুক্ত গুরুত্ব পায় নি। আরও স্মর্তব্য উত্তর-সাতচল্লিশ সময়ে মশাররফ-চর্চার প্রাবল্য লেখকের দেশ-কালের প্রেক্ষাপটকে আড়াল করে গেছে। পরবর্তী সময়েও মশাররফ-চর্চা, একই ছকে আবর্তিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের অনুসন্ধান অন্যতর তীর্যক দৃষ্টিকোণ থেকে, 'বিষাদ-সিন্ধু'র ঔপনিবেশিক পটভূমি ও কারবালা-কাহিনীর মিথকে উপন্যাসে ব্যবহার প্রসঙ্গে।

'বিষাদ-সিন্ধু' যার গ্রন্থবদ্ধ নাম, কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা অবলম্বনে রচিত এবং তা যেভাবে উপস্থাপিত সেই রচনাকে কী বলা যাবে ধর্মীয় কাহিনী, ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা আবশ্যিক কালানৌচিত্য সমৃদ্ধ ন্যারেটিভ? অথবা কি মিথ, যে বিষয়ে পুরাণকথা সমকালের বাস্তবতাকে ধারণ করে সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের হাতে যুগোপযোগী হয়?

সমকালে 'বিষাদ-সিন্ধু' পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিশেষত মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিকটে কারবালা কাহিনীর এই আবেগমথিত রূপটি

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

দ্বিতীয়রহিত স্থানে অভিষিক্ত হয়ে যায়। এর হেতু, আমাদের অনুমানে, মীরের জগৎ আর তাঁর পাঠকের জগতের অভিন্নতাই কেবল নয়, তাঁদের যূথগত সামাজিক রাজনৈতিক অন্ধকূপের একমাত্র আলোক উৎস হয়ে উঠেছিল এই গ্রন্থ। উল্লেখ্য মীর যাদের জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন অর্থাৎ তাঁর রসভোক্তাদের অল্পই সাক্ষর ছিলেন এবং সমসাময়িককালে এ গ্রন্থের পাঠকের চেয়ে শ্রোতার সংখ্যাই ছিল অধিক। পুথির জগতের পরিচিত পাঠক-শ্রোতা সহজেই এ রচনায় চেনা আবহের সন্ধান লাভ করল। বাল্যে মাতৃবিয়োগের দরুন পড়াশুনায় ছেদ ঘটলে মীর নিজেও অফুরন্ত অবসর কাটিয়েছিলেন পুথিপাঠে; এসময়ই মাতামহীর সান্নিধ্যে তাঁর আয়ত্তে আসে ইসলামী বিশ্বের চরিতকথা। অন্যতর পেশাদার কথকের সাক্ষাৎ না পেলেও মাতামহীর সূত্রে শ্রবণের অভিজ্ঞতা এবং 'বিষাদ-সিন্ধু'র গ্রন্থারম্ভে মীরের উৎস স্বীকার এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ। তিনি নির্ভুল হিসাব কষে নিয়েছিলেন নিজের আরব্ধ কর্মের ও শ্রোতার জগৎটির। প্রাথমিকভাবে তাঁর লক্ষ্য যে পাঠককুল, মুসলিম সাক্ষর-নিরক্ষর সমাজ, তাদের জগতে আর কোন বৈভব না থাক ধর্মের অভিমান যে ছিল তা মীরের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাৎক্ষণিকভাবে হতরাজ্য মুসলমান সমাজ ধর্ম গরিমায় চারপাশে প্রাচীর গড়ে তুলল, তিনি সেই ধর্মকাহিনীকেই নির্বাচন করলেন তার রচনার বিষয়বস্তুরূপে। বলাবাহুল্য এই মূর্ছিত আত্মগর্বী মুসলমানরা তাঁদের সম্প্রদায়ের অনতিবৃহৎ নেতৃত্ব বা অগ্রসর শ্রেণী। তারা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় ভাষার চর্চায় যুক্ত তো হলেনই না, পরে শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজির স্থানলাভে একঘরে হয়ে রইলেন। এই নেতৃত্বের— আবদুল ওহাব, সৈয়দ আহমদ, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, তিতুমির, হাজি শরীয়তুল্লাহ— লক্ষ্য যদিও ছিল বিভ্রান্ত মুসলমানদের পরিচালনা, প্রকারান্তরে বিদেশী ইংরেজরা দেশীয় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মুসলিমবৈরী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। যতদিন না ইংরেজদের কৌশলেই জাতিবৈরতার বিদ্বেষ হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে অসম্প্রীতির সূত্রপাত ঘটানোর প্রণোদনা দিতে থাকে। এই প্ররোচনামুক্ত মুসলিম চিন্তাবিদদের অন্যতম মীর মশাররফ হোসেন।

এই অচলায়তনে কেবল বিভিন্ন ধর্মীয় অলৌকিক আখ্যাননির্ভর দোভাষী সাহিত্যের প্রবেশাধিকার ছিল। মশাররফ হোসেন সেই অতিপরিচিত কাহিনী কাঠামো প্রায় অবিকল গ্রহণ করেন কালানৌচিত্য মেনে নিয়েও; তিনি দীর্ঘ এক শতকের (১৭৫৭-১৮৬০) শূন্যতা উৎরে এসে প্রায় বিচ্ছিন্ন হতে বসা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যচেতনার ডোল ফিরিয়ে সমন্বিত করে তুললেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মহামেডান লিটারারি এসোসিয়েসন সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানা যায় না। তাঁর পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়ও অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। যৌবনের চাপল্যে ও ভাগ্যবিড়ম্বনায় তিনি জীবিকা অর্জন করেছিলেন স্বশিক্ষার দৌলতে। দ্বিতীয় বিবাহ অনুবর্তী দাম্পত্যে কেবল তাঁর নিরুপদ্রব সাহিত্যজীবন সম্ভব হয়েছিল। হয়ত এমন স্রোতের বাইরে তৈরি হওয়াতেই তিনি সমকালীন বিদ্বৎসমাজের— মোহাম্মদ নইমুদ্দীন (১৮৩২-১৯০৮), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), রেয়াজউদ্দিন মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯), মোহাম্মদ মেহেবুল্লা (১৮৬১-১৯০৭), নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯৩৩), মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)— চেয়ে সৃষ্টিতে, চিন্তনে স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন। তাঁর রচনা সমাদর ঘটতে দেখি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত সাময়িক পত্রে; তাঁর গ্রন্থের যে শ্রেণীবদ্ধ আগাম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাও অসংশয়ে চিনিয়ে দেয় মীরের সাহিত্যচর্চার মুক্তবুদ্ধির প্রবণতাকে। এর আরও দৃঢ়তর প্রমাণ তাঁর ভাষাদর্শে।

কোন রচনার নির্মিতিকালীন সমাজ যেমন এর আঙ্গিককে আদল দেয়, তেমনি রচনাবস্তুও উপযোগী আঙ্গিকসন্ধান করে নেয়। এ বিবেচনায় মীর মশাররফ কোন ধরনের রচনায় আগ্রহী ছিলেন তারও হদিশ নেওয়া প্রয়োজন। রচনাকালবিচারে বঙ্কিমের প্রায় সমসাময়িক মশাররফ তাঁর প্রথম গ্রন্থকেই যখন বলেন 'কৌতুকাবহ উপন্যাস', তখন উপন্যাস আঙ্গিকটির বিষয়ে তিনি হালফিল অবগত ছিলেন বলে মনে করা যায়। কারবালা কাহিনীর মহাকাব্যিক সম্ভাবনা সম্পর্কে মধুসূদন দত্তের পত্রোল্লেখ, মীরের রচনারীতির কৌশল, চিত্রকল্পের ধরন, ব্যক্তিগত জীবনে বিবি কুলসুম সন্নিধানে মহাভারত শ্রবণ, 'বিষাদ-সিন্ধু'র অন্তত দুটি চরিত্রে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ছায়াপাত ও মিল প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের পর্যবেক্ষণ, কাসেমবধে মহাভারতের অভিমন্যু উপাখ্যানের সাদৃশ্য, কাহিনীর গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে মৌখিক মহাকাব্যের চরিত্র, রচনামধ্যে পুনরুক্তি-সম্বোধন-প্রত্যক্ষীকরণ প্রভৃতি কৌশল, আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত কাহিনীতে একক নায়ক এজিদের উত্থান পতন বধ, বীরত্বব্যঞ্জক ছন্দরীতি, সমাসবদ্ধ যুক্ত ব্যঞ্জন ও তৎসম শব্দরাজির ধ্বনিমণ্ডিত প্রয়োগ 'বিষাদ সিন্ধু'র উপন্যাস-বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্যারাডক্স হয়ে উঠেছে।

এ জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে 'বিষাদ-সিন্ধু'র উৎসনির্ভরতার ছলচাতুরিকে বিশ্লেষণ করলে– কি করে মশাররফের রাজভক্তির বুনিয়াদকে অতিক্রম করে ইতিহাসের হাতছানি অমোঘ হয়ে উঠল। যা অমোঘ হয়ে উঠবে 'বিষাদ সিন্ধু'র

ভূমিকায় লেখকের মন্তব্য পাঠে– 'কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সকলেই বিদিত রয়েছেন।' কাহিনীর অন্যতর তাৎপর্য না থাকলে তিনি এই পুনরায় কথনের শ্রম স্বীকারই বা করবেন কেন; বলা হয়ে থাকে, জগতে সূর্যের নিচে কোন কিছুই মৌলিক বা নতুন নয়, কেবল বলার ভঙ্গি ও কাঙ্ক্ষিত তাৎপর্য-অনুগ বয়ন স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে। মশাররফ রচনাবলী সম্পাদক অনুমান করেন তাঁর ফারসী ও আরবি গ্রন্থ অনুসরণের স্বীকৃতি নিছক প্রথানুসরণ ও পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জন ও আকৃষ্ট করার কৌশল। মশাররফের আরবি-ফারসি জ্ঞানে মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন সম্ভব কিনা প্রমাণ হয় নি।[১] সম্পাদক কাজী আবদুল মান্নান কারবালা কাহিনীর পুথির অন্তত কুড়িটি প্রসঙ্গে[২] ... নবীবংশের উত্তরাধিকারের মৃত্যু বিষয়ে জিব্রাইলের ভবিষ্যদ্বাণী, মাবিয়ার অনিচ্ছুক বিবাহ, মানুষের আকৃতিতে আজ্রাইলের বিবি ফাতেমার সঙ্গে সাক্ষাৎ, এজিদের রূপজ মোহ, মাবিয়ার অগোচরে ষড়যন্ত্র, জয়নাবের এককাধিক বিবাহ প্রস্তাব, জায়েদার প্রতিরূপ কদবানু চরিত্র, বিষপ্রয়োগকারী সম্পর্কে হাসানের সত্যগোপন, কুফার শাসনকর্তা জেয়াদের প্রতারণা, হোসেনের সশিষ্য পথ ভুলে কারবালায় উপস্থিতি, কাসেমের বিবাহ, হোসেনের যুদ্ধসজ্জা, ফোরাতের তীর মুক্ত করেও পানি পান না করে হোসেনের উঠে আসা, হোসেনের শিরশ্ছেদ, হোসেন ভৃত্যের কৃতঘ্নতা, গায়েবী জানাজা, চন্দ্রভাণ বা আজর নামে পৌত্তলিক চরিত্র, খণ্ডিত শিরের ঊর্ধ্বে গমন, জয়নাল আবেদিনের খোতবাপাঠে কুশলী হওয়া এবং বিজয়ী হানিফার পরিণতি... 'বিষাদ-সিন্ধু'র মূল খুঁজে পেয়েছেন। মুনীর চৌধুরীসহ অন্য গবেষকগণও একমত, 'মীর মানস যে প্রধানত বাংলা পুথির দুনিয়াতেই লালিত ও বর্ধিত হয়েছে।' আমরাও তাই মনে করি এবং তাতে মীরের মৌলিকত্ব হীন হয় নি।

কোন শিল্পই রাজনীতির সম্পর্করিক্ত নয়, বা শিল্পীও অরাজনৈতিক নন। বিশেষত ক্রান্তিকালে শিল্পচর্চা অধিকতর সংকেতসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যে সৃষ্টিলগ্নে লেখক-পাঠকের মেলবন্ধন দৃঢ় হয় নি এবং নিজেও উদ্দিষ্ট পাঠক গ্রাহ্যতা ও শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নন; তাই স্বীয় বক্তব্য তুলে ধরতে তাঁকে আরব-অনারব দ্বন্দ্বের আবরণে উপন্যাস রচনা করতে হয়। এই কৃতিত্বে তিনি এতই সফলকাম যে, শতবর্ষ পরের পাঠকের নিকটও তাঁর সৃষ্টি প্রাসঙ্গিক। মনে রাখতে হবে, শিল্পবিপ্লব-উত্তর ইউরোপে ব্যক্তির বিকাশের সম্ভাবনা, স্বপ্ন, প্রতিবন্ধকতাকে ঘিরে 'উপন্যাস' আঙ্গিক হিসেবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তির উপাখ্যান ন্যারেটিভের যোগ্য হয়ে ওঠেনি বরং এই আটসাট আঙ্গিকের অবসরে গুলে বকাওলী, রূপকথা জগতের

অনুপ্রবেশ ঘটে যেতে লক্ষ করি। ইংরেজ রাজত্বের প্রত্যক্ষ উপজাত 'উপন্যাস' আঙ্গিকটি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অকুলান হয়ে পড়ার বিষয়ও প্রাসঙ্গিক; মশাররফ হোসেনের প্রসঙ্গে যেমন ব্যক্তির চেয়ে সম্প্রদায় বিবেচ্য ছিল, যার অনুরণন শুনি পরিণত বয়সে উচ্চারিত সাহিত্যাদর্শে– 'সমাজের চৌদ্দ আনাকে ফেলিয়া দুই আনা লইয়া সাহিত্য সোপানে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন, করুন। কিন্তু দুই চারিজন লেখক চৌদ্দআনা দলের সহিত মিশিয়া ক্রমশ দুই এক পদ করিয়া অগ্রসর হইলে কি ভাল হয় না।' এই চৌদ্দআনার টানেই এমন এক কাহিনী নির্বাচন যা ধর্মভিত্তিক মানবযূথের অভীপ্সার প্রকাশ ঘটায়। ব্যক্তিগত যাপিত জীবনে প্রবৃত্তির অধিষ্ঠানের দৌর্দণ্ড দাপট নায়ক চরিত্রের সঙ্গে লেখকের আত্মজৈবনিক সাদৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দিলেও, সেই সূত্রে পক্ষপাতও অসম্ভব নয়। নিকট অতীতে এজিদের কাহিনীর আর একটি উজ্জ্বল সমান্তরাল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা এবং কারবালার যুদ্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্যতুল্য পলাশীর যুদ্ধ হতে পারে। সিরাজদ্দৌলার উচ্ছৃংখলতার অপবাদ, একরোখা, স্বাধীন সার্বভৌম স্বভাবের সঙ্গে নব্য শাসক এজিদের উত্থানের সাদৃশ্য দূরায়ত নয়। পলাশীর যুদ্ধের পরিণতি যেভাবে সুবে বাংলাকে পরাধীন করেছে ও সেই সূত্রে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ইহলৌকিকতায় ধস নেমেছে, তা দূর অতীতের কারবালা ট্রাজেডির ছায়ায় উপস্থাপিত হতে পারে। জগৎশেঠ-ঘসেটি বেগমদের ষড়যন্ত্রে, মীর জাফরদের শত্রুতায় ও পলাশীর যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা খুব সরলভাবেই আবদুল্লাহ জেয়াদের বিশ্বাসঘাতকতাতুল্য হতে পারে। মহম্মদী বেগের হাতে সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুর নৃশংসতা ও প্রক্রিয়া সীমারের হোসেন বধের অনুষঙ্গবাহী; সিরাজদ্দৌলার প্রণয়িনী লুৎফুন্নিসাসহ পলায়ন ও অনুরাগের কাহিনী এজিদের রূপমোহের সমান্তরাল। বিজিত মৃত্যুপথযাত্রী দামেস্কবাসী যে অভিযোগে এজিদকে অভিযুক্ত করে তার সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার নারী লাঞ্ছনার প্রতি তুলনা জাগা অস্বাভাবিক নয়। সমুদয় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বাংলায় ঘটেছিল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও রাজপুরুষদের মিতালীতে, অর্থ তার কেন্দ্রীয় চরিত্র; কোম্পানির অধীনতাস্বীকার বা বাংলার স্বাধীনতা হারানো, দুইই সম্ভব হয়েছিল অর্থের প্রতাপে। ফরাসী ও ইংরেজ ঐতিহাসিকদের চিত্রণে 'নারীলোলুপ' সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হলে বাংলা পরাধীন হয়, সহযোদ্ধা-স্বপক্ষীয়দের ষড়যন্ত্রে হোসেনও কুফাবাসীর ভরসায় আবদুল্লাহ জেয়াদের শরণ নিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের পরামর্শ উপেক্ষা করে। উভয় যুদ্ধই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূচনা করে। এমন অনুমানের প্রণোদনা আমরা মশাররফের জীবনী সূত্রেই উল্লেখ করতে পারি; ১২৮০র 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র মশাররফের

'জমীদার দর্পণ' নাটকটির সমালোচনা করেন, ১৮৮১র 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশ পেতে থাকে। ১৮৮২ সালেই ইংরেজ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্রীয় দপ্তরের চাকরি থেকে সরিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের জীবন ও সন্তান সম্প্রদায়ের কাহিনীর ছায়ায় সৃষ্ট 'আনন্দমঠে'র সত্যানন্দ চরিত্রে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বুনে দিলেন, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে। পরের সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র 'ইংরেজ' শব্দ পাল্টে যবন বা মুসলমান করে দিলেন। দুর্ভিক্ষনির্ভর কাহিনীর এই আপাত স্তরকে অতিক্রম করে পরবর্তীকালে পাঠকরা স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে রূপান্তর ঘটিয়ে নিয়েছিল এ তথ্য প্রমাণিত;[৪] এমন ঘটনা অসম্ভব নয় 'আনন্দমঠে'র অর্ধযুগ পরে 'বিষাদ-সিন্ধু' অনুরূপ একটি স্বাধীনতার কাহিনী লেখক বয়ন করেছিল। এ কাহিনী যতটা ব্যক্তির তারও অধিক সম্প্রদায়ের, সমাজের 'চৌদ্দ আনা'র ব্যক্তি এজিদের গ্লানিময় পশ্চাদপসরণ ও চিরস্থায়ী বন্দীত্ব নায়কোচিত নয় এবং ব্যক্তির বিকাশের প্রসঙ্গে কাহিনীর সূত্রপাত হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিনির্ভর কাহিনী হিসেবে থাকে নি, বরং অন্যরকম ইঙ্গিত আভাসিত বন্দী মন্ত্রী হামানের[৫] স্বগতোক্তিতে:

"স্বাধীনতার সূর্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরোদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা।... বিনা কারণে, প্রেমের কুহকে, পিরীতের দায়ে, প্রণয়-বাসনায়, পরিণয় ইচ্ছায় যদি এই রাজ্য (দামেস্ক) যথার্থই পরকরতলস্থ হয়, পরপদভরে দলিত হয়, আমাদের স্বাধীনতা লোপ হয়, তবে সে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। রাজা প্রজা-রক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক এবং করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব প্রজারই অধিক। রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব প্রজার... বাসিন্দা মাত্রেরই। যদি রাজ্য মধ্যে মানুষ থাকে হৃদয়ে বল থাকে, স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান থাকে, পরাধনি শব্দের যথার্থ বোধ থাকে, জন্মভূমির মূল্যের পরিমাণ জ্ঞান থাকে, একতাবন্ধনে আস্থা থাকে, ধর্ম্ম বিদ্বেষে মনে মনে পরস্পর বৈরীভাব না থাকে, জাতিভেদে-হিংসা, ঈর্ষা ও ঘৃণার ছায়া না থাকে, অমূল্য সময়ের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য থাকে, আলস্যে অবহেলা এবং শৈথিল্যে বিরোধী যদি কেহ থাকে, বিদ্যার চর্চা থাকে, আর সর্বোপরি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে যুগ-যুগান্তর হউক, সহস্রাধিক বর্ষে গত হউক, কোন কালে হউক, অন্ধকারাচ্ছন্ন পরাধীনতা-গগনে স্বাধীনতাসূর্যের পুনরোদয় আশা একবার করিলেও করা যাইতে পারে।"

— এই দীর্ঘ ক্ষেদোক্তিতে দামেস্ক নিয়ে যে বক্তব্য তা ভারতবর্ষের বেলায়ও অপ্রযোজ্য নয়। আবশ্যিক কালানৌচিত্য মেনে নিয়ে মশাররফ আধুনিক সময়োপযোগী ব্যঞ্জনা দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মশাররফের ইংরেজভক্তির বুনিয়াদও যাচাই করা উচিত। আত্মজীবনী 'আমার জীবনীতে তাঁর অকপট উল্লেখ– পিতা চিরকালই ইংরেজভক্ত। তিনি নিজেও তাই; অন্যান্য আত্মজৈবনিক রচনাসমূহ সাক্ষ্য দিচ্ছে তার পিতৃবন্ধু শালকর মধুয়ার নীলকর টি আই কেনী নীলকর-নীলচাষী দ্বন্দ্বে তার সমর্থন পেয়েছিলেন বংশপরম্পরায়। কর্মজীবনে তাঁর স্বস্তিবচন; 'এ ব্রিটিশরাজ্য, এখানে অবিচার হতে পারে না। একজন অবিচার করে শাস্তি দিলে, আর একজন সুবিচার করে শাস্তি দিবেন।[৬] এ নিছকই একজন জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারীর মনোভাব । আবার তার প্রেরণাময়ী স্ত্রী বিবি কুলসুমও স্বদেশী কর্মকাণ্ড ও দেশহিতব্রতী সভায় যোগদান পছন্দ করতেন না। এর কারণ কিছুটা অর্থনৈতিক ও খানিকটা সভাসমিতিকেন্দ্রিক রাজনীতির সঙ্গে মীরের অপরিচয় অর্থহীনতা আরোপ করেছে বলে মনে হয়। পারিবারিক গণ্ডিতে শৈশবে ইংরেজ সুহৃদ কর্তৃক শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে পাঠানোর প্রস্তাব বাতিল হয় মাতামহীর স্নেহাধিক্যে; আবার নীলকর ইংরেজদেরকে শাসক ইংরেজ থেকে আলাদা করে দেখার কারণ কি কর্মজীবনে আদালত সম্পৃক্ত পেশায় যুক্ততা? তার ইংরেজ প্রশস্তি কি চাকরিদাতা জমিদারের স্বার্থে তথা নিজের পেশাগত জীবনের নিরাপত্তায় রচিত? যদিও তার প্রত্যক্ষ মনিবদের হীন আচরণ আত্মজৈবনিক রচনায় অনুল্লেখ্য থাকে নি। এর বাইরেও বাস্তবতা, সেই সময়কালের মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে দেখা যায় নি, হয়ত তা মশাররফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'সামন্ততন্ত্রে শৃংখল ও মূল্যবোধ' বিলীয়মান এবং 'সদ্য উত্থিত ও বিকাশমান ধনতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া মূল্যবোধ' প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। এর প্রমাণে 'বিষাদ-সিন্ধু'তে বহুতরবার উল্লেখিত অর্থের অবিসংবাদী ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়। আর উপনিবেশিক শাসন কাঠামোর নিরাপদ অবস্থায় মুৎসুদ্দি শ্রেণীর রাজনীতি স্বার্থ প্রণোদিত হওয়াই স্বাভাবিক। যেহেতু তখনও শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণীর মধ্যে ভাবাবেগই সঞ্চারিত হয় নি। তাই তাদের স্বাধিকারসচেতনতায় ইংরেজবিদ্বেষ ততটা স্থান পায় নি, যতটা জাতীয়তাবাদ জায়গা পেয়েছে। এই উপলব্ধিকে আত্মস্থ করেই মীর স্বাধীনতাস্পৃহাকে কৌশলে চালিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মীরের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা বিশ্লেষণ করা যাক;[৭]

> 'স্বাধীনতা... কি মধুমাখা কথা! স্বাধীন জীবন কি আনন্দময়। স্বাধীন দেশ কি আরামের স্থান! স্বাধীনভাবের কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের সূক্ষ্ম শিরা পর্যন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অন্তরে বিবিধ ভাবের উদয় হয়। মহাহর্ষে মন নাচিতে থাকে, না হয় মহাদুঃখে অন্তর ফাটিয়া যায়। স্বাধীন মন, স্বাধীন জীবন, পরাধীনতা

> স্বীকার করিতে যেরূপ কষ্ট বোধ করে, আবার অন্যকে অধীনতা স্বীকার করাইতে পারিলে ঐ অন্তরেই অসীম আনন্দ অনুভূত হয়। এক পক্ষের দুঃখ, অপরপক্ষের সুখ।'

বন্দী ইমাম হোসেন পরিবারের জয়নাল আবেদিন প্রসঙ্গে লেখকের এই উচ্চারণ। এর পূর্বে হাসানকে বশ্যতাস্বীকার ও করদানের প্রস্তাবে এজিদ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। আগ্রাসী শক্তি হিসেবে দামেষ্ক-বাহিনী মদিনা হতে বিতাড়িত হয়। কারবালাপ্রান্তরে এজিদ অর্থের প্রলোভনে ও বিশ্বাসঘাতকতায় হোসেন বাহিনীকে হত্যা ও বন্দী করে। যদিও এই অধীনতা স্থায়ী হতে পারে নি আ'ম্বাজী বাদশা আবু হানিফার শক্তিপ্রয়োগে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র এই কাহিনীসূত্রে জবরদখল অর্থে দখলদারবাহিনী পরাভূত হয় নিজেদের সামর্থ্যে ও সহায়ক শক্তি দ্বারা। Colony শব্দের এক অর্থ জবরদখল– উপনিবেশ এই ঐতিহাসিক ধারণা সম্পৃক্ত। সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে বিজিত ভিনদেশী এলাকার শাসনসূত্রে সৃষ্ট হয় কলোনাইজেশন, কলোনিয়াল, কলোনিয়ালিজম প্রভৃতি। বন্দী জয়নাল আবেদিনকে শাসকের শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান গাইতে বলা হয় অনতিবিলম্বে; শাসনের যে কঠোরতা প্রদর্শন বা সেবার ভান করে বিজেতা তাতে যাবতীয় দ্যোতক শাসক অভিমুখী হয়। এই রদবদলে শাসিত নিজেকে পিছিয়ে পড়া, অযোগ্য, মুখাপেক্ষী ভাবতে শুরু করে; বিজিতের আত্মশক্তির খেই হারিয়ে যায়। মীরের ঔপনিবেশিক বাস্তবতা ছিল ইংরেজ ও নেটিভ– এই বিপরীত যুগ্মকের; 'বিষাদ-সিন্ধু'তে তিনি ধারণ করলে কাফের ও মুসলমান– এই যুগ্মককে। মুসলিম জগতের রাষ্ট্রনায়ক যিনি খলিফা নামে পরিচিত ও গণতান্ত্রিকভাবে মনোনীত হতেন মীরের কাহিনীতে, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন বাদশা ও প্রজাতন্ত্র রূপান্তরিত হল রাজতন্ত্রের। জবরদখল বোঝাতে খিলাফত পরিবর্তিত হল রাজতন্ত্রে।

আর এই অবলম্বনের সূত্র ছিল আদি ইতিহাসেই; কারবালার কাহিনীতে ঘটেছিল আরব-অনারব দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। যুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ই ইসলামেরই অনুসারী কেবল রাজনৈতিক অভিলাষে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব প্রচার পেয়েছে ধর্মযুদ্ধের ন্যায়। বিজয়ী উমাইয়া শাসকগণ ছিলেন ধনাঢ্য বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধি, তারা অনারব মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য করতেন; তাদের বলা হত মাওয়ালী। কারবালা কাহিনীর উপস্থিত রূপলাভে মাওয়ালীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আমরা মাওয়ালীদের প্রবর্তনায় ইমাম হোসেনের শাহাদাতের কাহিনীর বিশ্বব্যাপ্তি লাভকৃত রূপকে মিথ হিসেবেই চিহ্নিত করি। মিথ ইতিহাসের একটা স্তরকে ধারণ করে মননশীল সত্তারূপে বিকশিত হয়। সমাজ সংগঠন,

মতাদর্শ ধারণ, আদর্শ টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে মিথ পরম্পরা হয়ে থাকে। আদিম ইতিহাস বা অতিমানব আকাঙ্ক্ষা বংশানুক্রমিক গল্পমালার মাধ্যমে কোন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর আস্থার স্থল হয়ে ওঠে। আর যে মিথলজি অনেক লোকে ভক্তিভরে শোনে তা গোষ্ঠীবন্ধনের উপাদানরূপে কাজ করে। মিথ ভাবাদর্শের ধারকরূপে সর্বত্রসঞ্চারী হয়ে থাকে; মিথের আড়ালে থাকে ইডিয়লজি, ফলে মিথ থেকে সাহিত্যের ন্যারেটিভ গড়ে তোলা সম্ভব। ই ডব্লিউ হার্ড এরকম কয়েকটি উপায় বলেছেন[৮] : ১. স্বীকৃত মিথ নিয়ে, ২. বিশেষ বিষয় বা পরিস্থিতিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পরোক্ষ উল্লেখ, ৩. উপন্যাসের শরীর গঠনে মিথের প্রয়োগ, ৪. উপন্যাসের কোন অংশে মিথ সংগঠনের অচেতন প্রয়োগ এবং ৫. উপন্যাসে নতুন মিথের সৃষ্টি। মিথ ব্যবহৃত হবার সময় ইতিহাস ও রাজনীতির মাত্রাগুলো বেমালুম মুছে ফেলে। যেহেতু মিথ অনুজ্ঞাসূচক, স্মৃতিধার্য আপ্তবাচনকে যুগযুগ ধরে রাখে; মিথের বেসাতি চলে ইতিহাস ঊর্ধ্ব কয়েকটি ভাব নিয়ে যা বাস্তব বিশ্বে উহ্য থাকে।

এ প্রক্রিয়াই অনুসৃত হতে দেখি কারবালা কাহিনীর ক্ষেত্রে। হযরত মুহম্মদ (স)-এর জীবদ্দশায় ও খোলাফায়ে রাশেদিনের ৪০ বৎসর (৬২২ খৃ. - ৬৬১ খৃ.) ইসলামী রাষ্ট্রে যে ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা পরে ধারাবাহিকতা পায় নি এবং এই ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়নি। এর বিকাশের প্রক্রিয়াধীন সময়ে তৃতীয় খলিফা ওসমানের সময়ে আরবের উপজাতীয় সংগঠন রাষ্ট্রব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তার করে। হযরত ওসমান নিহত ও হযরত আলী খলিফা মনোনীত হলে দামেস্কের শাসক মুআবিয়া বিদ্রোহ করেন। পরপর উটের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধ হয়। মুআবিয়া পরাজিত হতে গিয়ে বর্শাগ্রে কোরআন উড়িয়ে সন্ধি করেন। ওসমান হত্যার বিচার নিয়ে মুসলিম জগতে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। হযরত আলীর পক্ষে স্বল্প সময়ে বিচার সম্ভব না হওয়ায় উমাইয়া বংশের মুআবিয়া এ সুযোগ কাজে লাগায়। হাশেমী বংশের ওসমানের আত্মীয়রা বিক্ষুব্ধ হতে থাকে, এভাবে খারিজীদের উৎপত্তি ও ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী নিহত হন।[৯] এ সময় আলীপন্থী শিয়াগণ উমাইয়াদের বিপকক্ষতা করে। ইমাম হাসান সন্ধিমত মুআবিয়াকে খিলাফত ছেড়ে দেন ও মুআবিয়া সন্ধিভঙ্গ করে ৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে এজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে হোসেন তাঁর পিতার অনুগৃহীত উবায়দুল্লাহ জেয়াদের আমন্ত্রণে কুফায় রওনা হলে পথভুলে ফোরাত তীরে পৌঁছলে আক্রান্ত হয়ে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। এজিদ ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং উমাইয়া বংশ ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে। পরে ইরানপন্থী শিয়াদের সহায়তায় আব্বাসীয়রা ক্ষমতা দখল করে ও ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করে।

এজিদ কারবালা যুদ্ধের পরে বন্দীদেরকে প্রত্যর্পণ করে ও যুদ্ধফেরত সৈনিকেরা মদিনায় এসে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে কারবালা কাহিনী বর্ণনা করে। আরবী ক্বাসিদা-আশ্রয়ী এই বর্ণনা পরে আব্বাসীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় অধিক উদ্যমে প্রচারিত হয়। আব্বাসীয় শাসনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় অবদানসহ মাওয়ালীদের নেতৃত্বে শুবীয়াহ আন্দোলন নামে একধরনের শুদ্ধি আন্দোলন শুরু হয়। আবু খাল্লান এর অগ্রভাগে ছিলেন। মাওয়ালীরাই উমাইয়া শাসকদেরকে নিষ্ঠুর, ভোগী, ষড়যন্ত্রী, বিশ্বস্ততা, রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করে। যাতে আব্বাসীয়দেরকে পয়গাম্বরের বৈধ ও যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এজন্য উমাইয়া আমলকে জবরদখলকারী, বিধর্মী ও নির্যাতনকারী রূপে দেখানো হয়। অথচ উমাউয়া সাম্রাজ্যের ৯০ বৎসরের অর্জন আব্বাসীয় রাজত্বের ভিত্তি ছিল এবং মাবিয়ার রাষ্ট্রনায়কোচিত সিদ্ধান্তে রক্তপাত ও গৃহবিবাদ এড়ানো গেছে।

সভ্যতার ইতিহাসে নিওলিথিক বিপ্লবের পর ধনবৈষম্য নির্ভর সমাজে অভিজাত ও পুরোহিতরা ছিল উৎপাদক শ্রেণীর শ্রমশোষক। প্রাক-রাষ্ট্রিক গোত্র ও উপজাতীয় সমাজে উৎপাদন-ভোগের ক্ষেত্রে সম্পদের বণ্টন, নারীর অধিকার ও মর্যাদা ভোগে বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। মানব ইতিহাসে সংস্কারক, বিপ্লবীরা বৈষম্য লোপের জন্য সাম্যবাদী যুগে যুগে সমাজ গড়ার সংগ্রাম করেছেন। প্রাক-ধনতন্ত্রী যুগে ঈশ্বরের ন্যায়রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। যদিও তা ইউটোপিয়ার অতিরিক্ত কিছু হয়নি। তাই কারবালা কাহিনীতে ইমামদের বংশানুক্রমিক শাসনের ব্যাঘাত দেখানো হয়েছে, যা শিআবাদ অনুসারী। শিআবাদে ইমামকে মর্ত্যে আল্লাহর জ্যোতির মূর্ত প্রতীক হিসেবে দেখানো হয় ও মোল্লারা রাষ্ট্র শাসন করে। সুন্নি ইসলামে ওলামাগণ যাজকীয় ভূমিকার অধিকারী নন। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে আলীপন্থীদের পরাজয় না ঘটলে যা হত তাই কাহিনীতে চিত্রিত হয়েছে, যেখানে এজিদকে পরাজিত বন্দী বলে দেখানো হয়েছে। কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার এই প্রচারণা ও বিশ্বপরিচিতি শিআদের একক অবদান।

যদিও সুন্নি বিশ্বাসে শিআগণ ধর্মবিরোধী অথচ মীরের উপস্থাপনার আপামর মানুষ এই নির্বাচিত অতীত বা ঐতিহ্যকে যথার্থই মনে করেছেন। সুদূর অতীতের আরব-অনারব দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুর ঘটনাটির যে রাজনৈতিক ব্যবহার ঘটেছিল সেই অণৃত, করুণা উদ্বেলিত কাহিনী শ্রেণীবিভক্ত ভারতবর্ষের বিপ্রতীপ মতাদর্শের

লেখক ও পাঠকের কাছে এমন কৌশলে পরিবেশিত হয়েছে যে পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে এজিদের দ্রোহ ব্যক্তিবিকাশের সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। এজিদ একজন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাতা হয়েও প্রজাবিচ্ছিন্নতার জন্য পরাজিত হয়। দৈবকাহিনীও ইহলৌকিকতামণ্ডিত ন্যারেটিভে রূপান্তরিত হয়। বিজয়ী ইমাম হানিফাও অনর্থক রক্তপাতের দায়ে দণ্ডিত হন, যে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব নিতান্তই আধুনিকযুগের পরিচয়বহ। কারবালার যুদ্ধটি পাঠকের নিকট ধর্মযুদ্ধের দ্যোতনাবহ প্রায়, যুদ্ধের নিয়মে মহাকাব্যসুলভ ব্যাপ্তি দিতে নারীচরিত্র যুক্ত হয়েছে কিন্তু ক্রমশ পৌরুষ অর্জনের অংশ হিসেবে জয়নাব অপ্রধান হয়ে গিয়ে যাজকশ্রেণীর বিপক্ষে ব্যক্তিগত শাসক এজিদের দ্রোহ সামনে চলে এসেছে। একই ধর্মের উপাসকদের দুই ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় একদল অপরকে বিভ্রান্ত করেছে। যা নিয়ে যুদ্ধ তার ঐতিহাসিক ন্যায়সন্ধান করলে লেখককে পক্ষাবলম্বন করতে হত। কিন্তু তিনি যুদ্ধের পরিণতিকে মুখ্য করে বিধ্বস্ত নগরীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের যে কাহিনী বয়ন করেন, তাতে অনৃত তথ্য থাকলেও এমন সম্প্রদায়গত ঐক্য সাধন করেন যে অভিজাত-আতরাফ উভয়শ্রেণীই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পারেন। আধুনিককালে উপন্যাসে মিথের ব্যবহার অপ্রতুল নয়, কারবালা কাহিনীও এখানে মিথের মর্যাদায় ব্যবহৃত। পক্ষ-প্রতিপক্ষ যুযুধমান, বিবাদের হেতু পরস্পরের নিকট ভিন্ন ও আপেক্ষিক। এমন একটি সর্বজনবিদিত কাহিনী বহু শতাব্দী পার হয়ে ভিন্ন সময়ে উপস্থাপিত হলে নতুন তাৎপর্যে আনতে পারে এর মিথগত বৈশিষ্ট্য সাপেক্ষেই। কাহিনীর প্রয়োগে শত্রু-মিত্র উভয়ই পাঠকের সহানুভূতি লাভ করে।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের আত্মজাগরণের প্রদোষে ধর্মীয় আবরণে একটি ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী পুনর্ব্যক্ত হলে অভূতপূর্ব যে জনপ্রিয়তা লাভ করে তা আমাদেরকে এর অন্য তাৎপর্য সন্ধানে উদ্যোগী করে। মীর মশাররফ হোসেন এই বিপ্রতীপ সম্ভাবনাগর্ভ কাহিনীতে নতুন মাত্রা সংযোজনের মধ্য দিয়ে তাঁর সময়ের তুলনায় অগ্রসর এবং বর্তমান জগতে যে রাজনৈতিক আয়ুধ আমরা ভিয়েতনামযুদ্ধে মার্কিন পরাজয়ের কলঙ্ক ঘোচাতে চলচ্চিত্রে-মিডিয়ায় অতিমানবিক আখ্যান দেখি, প্রচারনির্ভর এমনই একটি কাহিনী পুনর্নির্মিত হয়েছে পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে। একে ঔপনিবেশিকতা-সচেতন রচনা আখ্যা দিতে আপত্তি উঠতে পারে না।

তথ্যসঙ্কেত

১। কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, *মশাররফ রচনাসম্ভার,* ভূমিকা, খণ্ড ১, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৩। মুনীর চৌধুরী, *মীর-মানস,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮ দ্রষ্টব্য।

৪। চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ : রচনার প্রেরণা ও পরিণাম,* কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৩ দ্রষ্টব্য

৫। মীর মশাররফ হোসেন, বিষাদ-সিন্ধু, মশাররফ রচনাসম্ভার, ভূমিকা, খণ্ড ২, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৬০

৬। মীর মশাররফ হোসেন, *আমার জীবনী,* দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পা., ১৩৮৪, কলকাতা, পৃ. ১২০

৭। মীর মশাররফ হোসেন, *বিষাদ-সিন্ধু,* পৃ. ২১১

৮। E W Hard, *Myth Criticisms : Limitations & Possibilities.* London, p. 7

৯। Syed Ameer Ali, *A short History of the Saracen's,* New Delhi, Kitabmahal, 1977, p75-96